মাহমুদ ইউসুফ

পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন

২০০৭ সালের এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে ১২ জুন। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই রেজাল্ট প্রকাশিত হয়েছে এ বছর। এটাই প্রমাণ করে, শিক্ষা বোর্ডগুলোর কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে উন্নতি ঘটেছে।

গত শতাব্দীর শেষদিকে নকলের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে বিগত ছয়-সাত বছরে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এখন সব পরীক্ষাই প্রায় নকলমুক্ত। শিক্ষা ব্যবস্থার মানেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। এক সময় যে শিক্ষার্থী নকলের প্রত্যাশায় দিন গুনতো, এখন সেই শিক্ষার্থীকেই মূল্যবান সময়ে চেয়ার-টেবিলে বসে থাকতে দেখা যায়। নিয়মিত সে শ্রেণীকক্ষে হাজিরা দেয়। অনেক দুর্নীতিবাজ শিক্ষকও ছাত্রছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বনে সাহায্য করতো। তারাও এখন সততার পরিচয় দিচ্ছেন। মোট কথা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উভয়ের মানসিক জগতে একটি অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০০৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সনদ ও সমমান পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬২.২২ শতাংশ। এ বছর তা কিছুটা কমে দাড়িয়েছে ৫৮.৩৬ শতাংশে। তবে গড় পাসের হার কমলেও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বেড়েছে। পাশাপাশি শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল-মাদ্রাসাগুলোতে ফলাফলের বেশ তারতম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য নেতিবাচক। চিন্তারও একটি বিষয়। সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডগুলোকে এ বিষয় নিয়ে ভাবা দরকার। শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে ভালো পরমার্শ দিতে পারেন।

সমস্যাটা অনেক দিনের পুরনো। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা পিছিয়ে। এ ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। কিন্তু আমাদের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনাচারের প্রাণকেন্দ্র পল্লী মায়ের কোল। দেশের ৭০ শতাংশ লোক এখনো গ্রামে বাস করে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো কৃষি, যা গ্রাম অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। অথচ সেই কৃষক-শ্রমিক সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সব সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেকটা দূরে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা আরো পশ্চাৎপদ। এ সমস্যার সমাধান অতি জরুরি।

২০০৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়েছিল ৩০ হাজার ৪৯০ জন ছাত্রছাত্রী। ২০০৭ সালে ২ হাজার ১৬৭ জন বৃদ্ধি পেয়ে এ প্লাসপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩২ হাজার ৬৫৭। ঢাকা মহানগরীর স্কুলগুলো বরাবরের মতো এবারো ফলাফল সব অঞ্চলের চেয়ে এগিয়ে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ঢাকা ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এ প্লাস পেয়েছে ৫৬৪ জন ছাত্রী। অন্যদিকে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এ সংখ্যা মাত্র ৬৫২ (বোর্ড হিসেবে সবচেয়ে কম)।

বোর্ড হিসেবে ঢাকা বোর্ড জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯ হাজার ৪৩৯, রাজশাহী বোর্ড ৬ হাজার ৯১০, কুমিল্লা বোর্ড ২ হাজার ৩৮৭, যশোর বোর্ড ২ হাজার ৩২৯, চট্টগ্রাম বোর্ড ৩ হাজার ৩৩১, সিলেট বোর্ড ৭১৩, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ৬ হাজার ৮৮৯ এবং কারিগরি বোর্ড ২৫।

অতীতের হিসাবে দেখা যায়, সব বোর্ডেই এ প্লাসপ্রাপ্তির হার প্রতি বছরই কিছু না কিছু বাড়ছে। ভবিষ্যতে এ হার আরো বাড়বে। এ অবস্থায় জিপিএ নির্ধারণের ব্যাপারে নতুন করে ভাবা দরকার। পাইকারি হারে যদি এ প্লাসপ্রাপ্তির সংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং উচ্চতর ক্লাসে ভর্তির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতার্থে গ্রেড পয়েন্ট পুনর্নির্ধারণের ব্যাপারে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি।

নাম্বার	গ্রেড পয়েন্ট	গ্রেড
৯০+	৫.৫	A+
৮০-৮৯	৫	A
৭০-৭৯	৪.৫	B+
৬০-৬৯	৪	B
৫০-৫৯	৩	C
৪০-৪৯	২	D
৩৩-৩৯	১	E
০-৩২	০	F

উপরোক্ত ছকে আগের ৬০-৯০ ক্লাস ইন্টারভেলের A- উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। *মাইনাস* শব্দটি দ্বারা সাধারণত নেতিবাচক কিছু বোঝায়। তাই ওই গ্রেডটি না রাখাই বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে ৬০-৬৯ ক্লাস ইন্টারভেলে B এবং ৭০-৭৯ ইন্টারভেলে B+ যুক্তিসঙ্গত।

A+ সংক্রান্ত জিপিএ-এর ক্ষেত্রে বিকল্প আরো একটি সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। সেটা হলো অতিরিক্ত বিষয়ের নাম্বার ছাড়া মূল ১০টি বিষয়ের পরীক্ষায় যারা ৫ পয়েন্ট পাবে। (জনমুখে গোল্ডেন এ প্লাস হিসেবে প্রচলিত, যদিও আইনত এ ধরনের কোনো গ্রেড নেই) অর্থাৎ প্রতি সাবজেক্টের ৮০-এর বেশি নাম্বার পাবে একমাত্র তারাই A+ পাবে। আর অতিরিক্ত বিষয়ের নাম্বার সহযোগে যাদের গ্রেড পয়েন্ট ৫ হবে তাদের A গ্রেড প্রদান। গ্রেডিং পয়েন্ট নির্ধারণের উপরোক্ত তালিকাটি প্রচলিত সিস্টেম থেকে অনেকটাই বিজ্ঞানসম্মত বলে আমাদের মনে হয়। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন।

পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি ও শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রেও গরমিল লক্ষ্য করা যায়। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রায় তিন মাস ও রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার ছয় মাস আগে। পরীক্ষা শুরু হয় মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং ফলাফল প্রকাশিত হয় সাধারণত জুন মাসে। জুলাই মাসে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। অথচ দেখা যায়, ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হতে আরো দুই-তিন মাস দেরি হয়। ইউনিভার্সিটিতে যে সেশনজট চলছে তার সূচনা কিন্তু এখানেই।

এইচএসসি শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় জুন মাসে। জুলাই থেকে ডিগ্রি বা সমমান ক্লাসের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। অথচ এইচএসসি পরীক্ষা প্রতি বছর জুলাই মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। আর রেজাল্ট প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে। এরপর উচ্চতর ক্লাসে ভর্তি হতে হতেই প্রায় দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যায়। ফলে এখানেই এক বছর সেশনজট সৃষ্টি হয়। এ জট চলতে থাকে বছরের পর বছর।

এ সমস্যা দূরীকরণে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এসএসসি পরীক্ষা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু করা যেতে পরে। বছরের শুরুতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রেজাল্ট প্রকাশ করা সম্ভব। তাহলে মে মাসের মধ্যে ধীরস্থিরভাবে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। তখন জুন বা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু করতে কোনো বেগ পেতে হবে না।

অন্যদিকে মাধ্যমিক পরীক্ষা জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ হলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে বা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু করা যেতে পারে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে পরীক্ষা শেষ করতে পারলে জুন মাসের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশ করা সম্ভব। একটু তৎপর হলে এ মাসের মধ্যে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সার্টিফিকেটও ছাত্রদের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোর মধ্যে বর্তমানে যে হারে বিরতি দেয়া হচ্ছে সেটা উঠিয়ে নেয়া উত্তম। এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালুর আগে দৈনিক দুটো করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোনো সমস্যা হতো না। তাই দুই পরীক্ষার ফাকে এক বা একাধিক দিন ছুটি দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এ প্রথা বন্ধ হলে পরীক্ষা শেষ হতে অনেক কম সময় লাগবে। গ্রেডিং পদ্ধতি, পরীক্ষা অনুষ্ঠান সময়সূচি, রেজাল্ট প্রকাশ, অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এসব বিষয় পুনর্বিবেচনা করলে শিক্ষার্থীদের জন্য তা ইতিবাচক ভূমিকাই রাখবে।

যুগান্তর
তারিখ ... 27 JUN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬